# অখণ্ড ভারত ও দক্ষিণ এশিয়াতে ভারতের সিভিলাইজেশানাল দাবি

উদয়ন দাস

২৮ আগস্ট, ২০২৩

ভারতের নতুন সংসদ ভবনের একটি ম্যুরাল দক্ষিণ এশিয়ার বেশ কিছু দেশে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। অখণ্ড ভারতের ধারণার প্রতি ইঙ্গিতবাহী এই প্রাচীন মানচিত্রটি দক্ষিণ এশিয়ার বর্তমান রাষ্ট্রগুলিকে অতীতের একটি সবৃহৎ, অবিভক্ত রাষ্ট্রশাসনব্যবস্থার অংশ হিসেবে চিত্রিত করে। এই ম্যুরালের উদ্ঘাটনের পর, তার ফলশ্রুতি হিসেবে, পাকিস্তান, নেপাল এবং বাংলাদেশে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। মানচিত্রে যে দাবির আভাস পাওয়া যায় তা কিভাবে এই দেশগুলির স্বাধীনতা ও স্বায়ত্বশাসনকে বিপন্ন করেছে, সে বিষয়ে সেই দেশগুলি উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

ঐতিহাসিকভাবে, অনেক রাষ্ট্রই সিভিলাইজেশানাল বা নিজেদের দেশের প্রাচীন সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বকেন্দ্রিক যুক্তির মাধ্যমে তাদের রাজনৈতিক দাবিকে প্রকাশ করেছে, যেখানে বর্তমানের রাজনৈতিক দাবিগুলিকে বৈধতা দেওয়ার জন্য অতীতের সংস্কৃতিকে আদর্শ হিসেবে আহ্বান করা হয়। উদাহরণ হিসেবে, সিভিলাইজেশানাল আকাঙ্ক্ষা এবং ইরেডেন্টিজম অর্থাৎ নৈতিক বা ঐতিহাসিক কারণের ভিত্তিতে অন্য রাষ্ট্রের অধিকৃত এলাকার উপর দাবি - এই দুই অবস্থার মধ্যের সম্পর্ককে বিবেচনা করা যায়। অতীতে কোনও রাষ্ট্রের সীমানাসূচক রেখা যেমন ছিল তার সিভিলাইজেশানাল বোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ওই রাষ্ট্র কোনও অঞ্চলের উপর অধিকারের দাবি রাখে। সিভিলাইজেশানাল আকাঙ্ক্ষার উপর ভিত্তি করে কি ভারতের দক্ষিণ এশিয়াকেন্দ্রিক নীতিতে একটি দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন আসছে? এর ফলে ভারতের সঙ্গে কি তার দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশীদের সম্পর্ককে জটিল হয়ে উঠবে?

*ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স*-এ ২০২৩ সালের মার্চ মাসে প্রকাশিত একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধে শুভাশিস চ্যাটার্জি ও আমি একসঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পক্ষ থেকে, বিশেষ করে ২০১৪ সাল থেকে শুরু হওয়া, সিভিলাইজেশানাল বিতর্কটিকে পরীক্ষা করে দেখেছি। দক্ষিণপন্থী ভারতীয় জনতা দল (বিজেপি)-র উত্থান এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকারকে নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই দল যে পরিমাণ রাজনৈতিক পরিসর অধিকার করতে পেরেছে, সেই দুটি বিষয়কে মাথায় রেখে, একটি দক্ষিণ এশিয়াকেন্দ্রিক হিন্দুত্ববাদী, দক্ষিণপন্থী নীতি তৈরি হয়েছে কিনা, তা আমরা জানতে চেয়েছি। যদি সত্যিই এমন নীতি থেকে থাকে তাহলে, অখণ্ড ভারতের পুনরুদ্ধারে বিশ্বাস ও তা অর্জনের আকাঙ্খার মত যে ধরনের প্রাথমিক যুক্তি হিন্দু দক্ষিণপন্থীরা, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতে দিয়ে থাকেন, এই অঞ্চলের জন্য ভারতের যে কর্ম-পরিকল্পনা আছে, তাতে সেই যুক্তিগুলির প্রতিফলন ও উপস্থিতি দেখতে পাওয়া উচিত।

## সিভিলাইজেশানাল আখ্যান ও সরকারি আচরণ

বিজেপির নেতৃত্বে নির্মিত দক্ষিণ এশিয়ায় সিভিলাইজেশানাল বিতর্কটি দুটি স্তরে কাজ করে। সরকারি স্তরে, বিজেপি শাসনের উত্থান সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার বিষয়ে ভারতের নীতি নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনও অনানুষ্ঠানিক বিকল্প ও সরকারি জবানবন্দী নেই বা হিন্দুত্বকে অনুমোদন দেওয়ার মত পদক্ষেপ নেওয়া

হয়েছে এমন নয়। দ্বিদেশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে, ভারত ও তার দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশীরা তাদের পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত ছন্দে সাধারণভাবে যেমন চলে, তেমনভাবেই ব্যবসায়িক আদানপ্রদান চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি, বর্তমান সরকার যে চেষ্টা করছে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির মাধ্যমে তার ব্যতিক্রমতার উপর জোর দেওয়ার - সেটিও নতুন কোনও বিষয় নয়, যদিও এই সরকার সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উপাদানের উপর বেশি জোর দেয়। তবে, এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, এই ধরনের প্রচেষ্টা যোগব্যায়ামের মত হিন্দু ধর্ম থেকে আহৃত আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক চর্চার প্রচার করছে, এবং পাশাপাশি পেশিবহুল জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বাসের সমজাতীয়তার মত যে বিতর্কিত বিষয়গুলিকে হিন্দুদের অধিকার হিসেবে ধরা হয়, সেগুলি থেকে স্পষ্টতই দূরে থাকছে। যদিও, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উপাদানগুলির ক্রমবর্ধমান আধিপত্য কোনভাবেই বোঝায় না যে, ভারতের পররাষ্ট্র নীতির মূল সূত্রে কোনরকম পরিবর্তন এসেছে। দক্ষিণ এশিয়ার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগের ব্যাপারটিতে পরিবর্তন ঘটে নি, বরং তা যে আগের মত করেই চলছে – এ থেকে মনে হয় যে, সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি অধিকাংশ সময় শুধুমাত্র প্রদর্শনীর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

কোনভাবেই অস্বীকার করা যাবে না যে, মাঝেমধ্যে উচ্চারিত সাড়ম্বর উক্তি ও একটি সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি সিভিলাইজেশানাল রাষ্ট্র হিসেবে ভারতের ধারনাকে প্রশ্রয় দেওয়ার মত বিষয়গুলি নীতিতে পরিবর্তিত না হলেও, দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের জন্য সেগুলির গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য আছে। অখণ্ড ভারতের ধারণার দিক থেকে বিচার করলে, এই মানচিত্রটি যা দেখায় তা হল, দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিতে ভারতের হিন্দু অধিকারের মূল সিভিলাইজেশানাল দাবি। এই দাবি অনুযায়ী, সম্পূর্ণ আধুনিক দক্ষিণ এশিয়া, সিভিলাইজেশানাল ধারণা অনুযায়ী, ভারতের অধিকারে। বিনায়াক দামোদর সাভারকর এবং এম. এস. গোলওয়ালকারের মত হিন্দুত্ববাদী মতাদর্শে বিশ্বাসীদের লেখাতে ইতিহাসের এই পাঠের বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। এই পাঠ বিশ্বাস করে যে, ভারতীয় সভ্যতা প্রথমে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত ছিল, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের ফলে যার মধ্যে চূড়ান্ত আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয়। অখণ্ড ভারতের কল্পনাটি অতীত হিন্দু গরিমার অনুভূতি, নিজেকে নির্যাতিত জাতি হিসেবে দেখার বোধ, এবং নিজের ন্যায়সঙ্গত পরিসরকে পুনরাধিকার করার সংকল্পকে বহন করে।

এই জোরাল চিত্রকল্পটির উপস্থিতি সত্ত্বেও, তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও নীতি হিসেবে উদ্ভাবন করা হয় নি। ক্বচিৎ রোমান্টিকতার বাইরে গিয়ে, হিন্দু দক্ষিণপন্থী সংগঠন যা, শাসকদল বিজেপির ভাবাদর্শগত পূর্বসূরীও বটে, সেই আরএসএসের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মুখপাত্ররা এই কল্পনাকে রাজনৈতিক নয়, বরং একটি সাংস্কৃতিক ধারণা হিসেবে দাবি করেছেন। হিন্দুত্ববাদের কারণে নয়, বরং তার উপস্থিতি সত্ত্বেও পাকিস্থান ও চিনের সঙ্গে আঞ্চলিক অধিকার নিয়ে সংঘর্ষ যথেষ্ট জীবন্ত। সীমান্তের পুনর্গঠনের কথা আরএসএস ভাবছে না, বা বিজেপি সরকার তা বিবেচনাতেও আনছে না। প্রাথমিকভাবে এর কারণ হল, অখণ্ড ভারতের ধারনাটি দক্ষিণ এশিয়া সংক্রান্ত কোনও নীতিকে মূর্ত করে না। এর সাড়ম্বর বক্তব্যের লক্ষ্য হল দেশের নাগরিক ও বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয় অভিবাসীরা।

বিশ্বের ক্রমে ন্যায্য স্থান অধিকারের জন্য, ভারত তার পররাষ্ট্র নীতির একটি উপাদান হিসেবে সর্বদাই সিভিলাইজেশানাল আখ্যানকে ব্যবহার করেছে। সভ্যতার কল্পনা কিভাবে নির্মিত হয় সে বিষয়ে নেহরুর ধারণা এবং হিন্দুত্ববাদের ধারণা, দুইয়ের মধ্যে অনেক বদল এসেছে। দেশের অভ্যন্তরে হিন্দুত্ববাদের উর্ধ্বগামী আধিপত্য বিশ্বমঞ্চে পুনরুদীয়মান হিন্দুরাষ্ট্রের আখ্যানটির সঙ্গে মিলে যায়, যা সিভিলাইজেশানাল পরিসরের পুনরুদ্ধার করে। অখণ্ড ভারতের ধারণা দেশের মধ্যে একটি জনপ্রিয় আখ্যান হলেও, তার বাইরে গিয়ে, আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক স্তরে তাকে কেন্দ্র করে কোনও নীতি প্রণয়নের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে

এমন নয়। সরকারিস্তরে এই জাতীয় কোনও নীতির নির্মাণ নিয়ে অভ্যন্তরীণভাবে কোনও রকম আলোচনা হচ্ছে, এমন ইঙ্গিতও পাওয়া যাচ্ছে না। এমনকি, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ ও শ্রীলঙ্কার মত দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশের সঙ্গে লেনদেনের সময় এই ধারণাকে কোনও জায়গাও দেওয়া হয় না। চিন যেমন তাইওয়ান ও দক্ষিণ চিন সমুদ্রে নিজের অধিকারের দাবি রাখে, ভারত তার প্রতিবেশী এলাকাতে তেমন দাবি রাখে না।

গুরুত্বপূর্ণভাবে, সমস্ত রাজনৈতিক বিন্যাস জুড়েই ভারতের বিকাশের জন্য দক্ষিণ এশিয়াতে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা ভারতের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ঐতিহাসিকভাবে, ইরেডেন্টিজম বা আঞ্চলিক সম্প্রসারণের কোনও চিহ্ন ভারতীয় রাষ্ট্রযন্ত্রে কখনই দেখা যায় নি। পাকিস্তান বাদে, দক্ষিণ এশিয়ার সমস্ত প্রতিবেশী দেশের সঙ্গেই সীমান্ত নিয়ে দ্বন্দ্বের সমাধান ভারত করে ফেলেছে। পররাষ্ট্র নীতি আদতে তো বাইরের পৃথিবীর জন্য তৈরি এমন একটি পরিকল্পনা, যার লক্ষ্য দেশের আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন। পররাষ্ট্র নীতি যে আন্তর্জাতিক আবহাওয়ায় ক্রিয়াশীল, সেখানে অনেক কিছুকেই ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হয়। সার্বভৌমত্বের ভিতরে ক্রিয়াশীল দেশীয় রাজনীতিতে সরকারের হাতে অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ থাকে। তার বিপরীতে, আন্তর্জাতিক পরিসরের ক্ষেত্রে অন্যান্য রাষ্ট্র, উপাদান, আদর্শগত গুণক, আইন এবং প্রথা ইত্যাদিকে বিবেচনা করতে হয়। দেশীয় রাজনীতিতে প্রতিবর্তন সত্ত্বেও, ভারতের পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্তন নয়, বরং অনেক বেশি ধারাবাহিকতা ও ঐক্যমত্য দেখা যায়। ভারত অবিচলিতভাবে নিজেকে একটি দায়িত্বশীল শক্তি হিসেবে দাবি করে, যে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে একত্রে কাজ করে ও অতিরিক্ত অঞ্চল অধিকারের কোনও উচ্চাকাঙ্ক্ষা যার নেই। বাস্তবিকই, ভারত যথেষ্ট বন্ধুত্বপূর্ণভাবেই বাংলাদেশের সঙ্গে ভূ ও সামুদ্রিক সীমান্ত নিয়ে সমস্যার সমাধান করেছে। ঔপনিবেশিকতা থেকে মুক্তি সংক্রান্ত আগেরকার সমস্ত সমস্যাগুলির বিষয়ে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি একনিষ্ঠভাবে একই অবস্থান বজায় রেখে চলেছে এবং গ্লোবাল সাউথের কণ্ঠস্বর হিসেবে নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করেছে। একটি দায়িত্বশীল শক্তি হিসেবে ভারতের উত্থানের বিষয়টি, দক্ষিণ এশিয়াতে তার সিভিলাইজেশানাল দাবির যে আখ্যান, তার বিপরীতে অবস্থান করে।

সরকারের দিক থেকে গভীর নীরবতা বা উদাসীনতার অর্থ এই নয় যে, এই আখ্যানগুলির কোনও গুরুত্ব বা তাৎপর্য নেই। পররাষ্ট্র নীতির কাজকর্ম শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক লেনদেন, প্রেস রিলিজ ও সম্মেলনেই সীমাবদ্ধ থাকে না। দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি যে এখনও কঠিন, তার কারণ বিজেপির দায়িত্বে নির্মিত ভারতের সিভিলাইজেশানাল উক্তি, যদিও সরকারিস্তরে সেগুলির ব্যবহার হয় না। ভারতের পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবি উঠে আসার ফলে, তার প্রতিবেশী দেশগুলির মধ্যে যে নিরাপত্তাহীনতার ভাব, দোষারোপের প্রবণতা এবং এমনকি সেই দাবি অনুকরণ করার মত ঘটনা ঘটতে দেখা যাবে, তা খুব একটা অস্বাভাবিক বিষয় নয়। দুই স্তরে এই ধরনের আদানপ্রদান অনেক সময়ই ভারতের নিজের ভাবমূর্তির ক্ষেত্রে এবং দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে তার লেনদেনের সময় পরস্পরবিরোধী পরিপ্রেক্ষিত এবং দ্যোতনা তৈরি করে।

উদাহরণ হিসেবে ম্যুরাল সংক্রান্ত এই সাম্প্রতিকতম বিতর্কটির কথা ধরা যাক। ম্যুরালটির উদ্ঘাটনের পর ভারতের সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রক বা মিনিস্ট্রি অফ পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স ট্যুইট করে, "সংকল্প স্পষ্ট - অখন্ড ভারত।" অচিরাত নেপাল ও বাংলাদেশ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ট্যুইটটির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জানান হয়। ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রক বা মিনিস্ট্রি অফ এক্সটার্নাল অ্যাফেয়ার্সের মুখপাত্র অরিন্দম বাগচি ব্যাখ্যা করেন যে, এই ম্যুরালটির বিষয় অতীতের লৌহ যুগের মৌর্য সাম্রাজ্যের আঞ্চলিক মানচিত্র এবং দক্ষিণ এশিয়াতে ভারতের কোনও আঞ্চলিক উচ্চাকাঙ্খা নেই। আশ্চর্যজনকভাবে, ম্যুরাল উদ্ঘাটনের ঠিক পরেই নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কুমার দহল ভারত সফরে আসেন, এবং তার আগে পর্যন্ত ওই মানচিত্র নিয়ে নেপাল কোনও আপত্তি তোলে নি। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কয়েকটি প্রাথমিক মন্তব্যের পর, নতুন দিল্লি ও ঢাকার মধ্যেও এই বিষয়ে আর কোনও আলোচনা হয় নি। এই আপত্তিগুলি

সরকারিনীতির পরিসরে প্রবেশ না করলেও, ভারতকে মানচিত্রের বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে হয়েছে এবং তার দক্ষিণ এশীয় প্রতিবেশীদের উদ্বেগ দূর করার পদক্ষেপ নিতে হয়েছে।

**দক্ষিণ এশিয়ায় অসামঞ্জস্য**

যদি ভারতের সিভিলাইজেশানাল উচ্চাকাঙ্খার ফলে, সাধারণ দ্বিদেশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা না হয়, তাহলে এই আপত্তিগুলি আদৌ উঠে আসে কেন? এর মোটামুটি দুটি কারণ আছে। প্রথমটি হল দক্ষিণ এশিয়ার ভৌগলিক এবং ক্ষমতার অসামঞ্জস্যসহ একটি পরিকাঠামোকেন্দ্রিক কারণ। এই অঞ্চলে ভারতের ক্ষমতার ছায়া সুদীর্ঘ এবং বস্তুগত হোক বা সাংস্কৃতিক – ভারতের দিক থেকে যে কোন ধরনের ক্ষমতার প্রদর্শনই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দক্ষিণ এশিয়াতে কোনও রকম আঞ্চলিক সহযোগিতা নির্মাণের প্রচেষ্টাটি যে কঠিন হয়ে উঠেছে তার কারণ এই অসামঞ্জস্য। দ্বিতীয় কারণটির চরিত্র অনেক বেশি রাজনৈতিক। ঠিক যেমন ভারতের সভ্যতাগত উচ্চাকাঙ্খার আখ্যানটির লক্ষ্য তার নিজের নাগরিকরা, এর প্রদর্শনের বিরুদ্ধে আপত্তিও তেমনই দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলির আভ্যন্তরীণ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। নিজের বিশিষ্ট পরিচয় প্রতিষ্ঠা করার জন্য, ভারত যেভাবে সমগ্র অঞ্চলের সংস্কৃতিকে আত্মসাৎ (কালচারাল অ্যাপ্রোপ্রিয়েশান) করে, দক্ষিণ এশিয়ার অন্য দেশগুলি সচেতনভাবে তার থেকে দূরে থাকে। একটি প্রভাবশালী ভারতবিরোধী মনোভাবের প্রেক্ষাপটে, এই দেশগুলির রাজনৈতিক খেলোয়াড়রা এমন একটি স্বাধীন ও সুবিন্যস্ত অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন, যা ভারতের সভ্যতাগত বিতর্কের সঙ্গে পাল্লা দেবে। রাজনীতিবিদরা এই অবস্থানটি নেওয়ার ফলে, তাঁদের দেশের নাগরিক ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি বুঝতে পারেন যে, তাঁরা নিজেদের আদর্শকে বিক্রয় করেন নি। ভারতের সিভিলাইজেশানাল দাবির বিরুদ্ধে একটি কঠোর অবস্থান একটি বিশিষ্ট জাতীয় পরিচয়ের আভ্যন্তরীণ চলন আরম্ভ করতে সাহায্য করে। দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির মাথার গভীরে প্রোথিত স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদের ধারণা এই ধরনের আপত্তির দ্বারা চিহ্নিত ও অনুসৃত হয়।

সূক্ষ বা অতিপ্রকট যাই হোক না কেন, ভারতের সিভিলাইজেশানাল দাবি কি দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে তার সম্পর্ককে প্রভাবিত করতে চলেছে? তার পাশাপাশি, সিভিলাইজেশানাল দাবি ও তার পালটা দাবিগুলি ভারত ও দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যেকার বর্তমান সম্পর্ককে প্রভাবিত না করেই টিঁকে আছে। মতভেদ থাকা সত্ত্বেও, দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলি নতুন দিল্লির সঙ্গে বৈধ স্বার্থ ও নির্ভরশীলতার সম্পর্ক ভাগ করে নেয়। এই দেশগুলি যথেষ্ট বাস্তববাদী বলেই শুধুমাত্র প্রাচীন সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের এই আড়ম্বরপূর্ণ আখ্যানের উপর ভিত্তি করে ভারতের প্রতি তারা তাদের ব্যবহারের ধাঁচ বদলায় নি। এই দেশগুলি যে ভারতের এই ধরনের আকস্মিক সিভিলাইজেশানাল দাবির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখাবে, তার সম্ভাবনা সব সময়ই থাকবে, কিন্তু সেই প্রতিক্রিয়াকে আদৌ নীতিতে পরিণত করা হচ্ছে, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নি। যখন, ভারতের প্রভাবের ফলশ্রুতি হিসেবে ওই দেশগুলির প্রাথমিক স্বার্থ বিপন্ন হয়, তখন অবশ্যই সিভিলাইজেশানাল বিতর্কের গতিপথ অনুসরণ করে, দক্ষিণ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এমন একটি নিরাপত্তারহীনতার মনোভাব তৈরি হবে, যা আদ্যন্ত ভারতবিরোধী। নেপালের তথাকথিত অবরোধ বা বাংলাদেশের সঙ্গে নদীর জল ভাগাভাগির মত অতীতের ঘটনার সময় দেখা গেছে যে, এইগুলির কারণে সংশ্লিষ্ট দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠের মত ভারতের বিরুদ্ধে গেছে এবং চিনের সঙ্গে ব্যবহারে একটি ভারসাম্য আনার প্রস্তাবনাও দেওয়া হয়েছে। ভারতের সিভিলাইজেশানাল দাবি এবং তার সঙ্গে জড়িত নিরাপত্তাহীনতার বোধ, এই রকম ঘটনার ক্ষেত্রে হয়ত একটি বিশেষ অস্ত্র হয়ে উঠবে।

*উদয়ন দাস ভারতের কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক।*